দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ (Weighing The Universe)

প্রায়ই বলা হয়, ওপরে যে যায়, তাকে নীচে নামতেই হবে। আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারা কোনো বস্তু মহাকর্ষের টানে আটকা পড়ে। বাধ্য হয় নীচে নেমে আসতে। কিন্তু সব সময় তা হয় না। যথেষ্ট জোরে চললে বস্তুটির পক্ষে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে মহাশূন্যে চলে যাওয়া সম্ভব। ফিরে আসতে হবে না আর কখনও। যেসব রকেটের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রহে যান পাঠানো হয় সেগুলো এই বেগ (মুক্তি বেগ) অর্জন করে।

এই মুক্তিবেগের মান সেকেন্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। এই বেগ কনকর্ড বিমানের বিশ গুণেরও বেশি। দি সঙ্কট মান পৃথিবীর ভর (এতে যতটুকু পদার্থ আছে) ও ব্যাসার্ধ দুটোর ওপরই নির্ভর করছে। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তু যত ছোট হবে, এর পৃষ্ঠে মহাকর্ষ তত বেশি শক্তিশালী হবে। সৌরজগৎ থেকে বের হতে পারার অর্থ হলো সূর্যের মহাকর্ষকে জয় করা। এক্ষেত্রে মুক্তি বেগের মান সেকেন্ডে ৬১৮ কিলোমিটার। আমাদের মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ থেকে বের হতেও সেকেন্ডে কয়েকশ কিলোমিটার বেগ লাগবে। অন্য দিকে, একটি নিউট্রন নক্ষত্রের মতো ঘন বস্তু থেকে বের হয়ে যেতে সেকেন্ডে কয়েক অযুত কিলোমিটার বেগ প্রয়োজন। আর ব্ল্যাক হোল থেকে বের হতে তো লাগবে আলোর চেয়ে বেশি বেগ (সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার)।

আর মহাবিশ্ব থেকে বের হতে চাইলে? ২য় অধ্যায়ে আমি বলেছি, মহাবিশ্বের কোনো প্রান্ত আছে বলে মনে হয় না। ফলে, বের হবার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমরা যদি ধরে নেই প্রান্ত আছে এবং আরও ধরা যাক, এই প্রান্ত হলো আমাদের দৃষ্টিসীমার শেষ বিন্দুতে (প্রায় দেড় হাজার আলোকবর্ষ দূরে), তাহলে মুক্তি বেগ হবে প্রায় আলোর বেগে সমান। এই ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দেখে মনে হচ্ছে, সবেচেয়ে দূরের ছায়াপথরা আমাদের থেকে প্রায় আলোর বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। দেখে তো মনে হয়, ছায়াপথরা এত দূরে সরছে যে তারা হয়ত মহাবিশ্ব থেকে বেরই হয়ে যাবে। সেটা না হলেও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন যেন হবেই। ফিরে আসবে না কখনো।

আসলে দেখা যাচ্ছে যে প্রসারণশীল মহাবিশ্ব আসলে অনেকটাই পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মতোই আচরণ করছে। যদিও মহাবিশ্বের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রান্ত নেই। প্রসারণের গতি খুব বেশি হলে সরতে থাকা ছায়াপথগুলো মহাবিশ্বের সব পদার্থের সম্মিলিত মহাকর্ষীয় বন্ধন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আর এতে করে প্রসারণ চলবে চিরকাল। অন্য দিকে, প্রসারণ ধীর হলে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে যাব। মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে শুরু করবে। ছায়াপথরা তখ আবার ‘নীচের দিকে’ নামতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত ঘটবে চূড়ান্ত মহাজাগতিক বিপর্যয়। পতন হবে মহাবিশ্বের।

এর মধ্যে কোনটি ঘটবে? দুটি সংখ্যার তুলনার মধ্যে এর উত্তরটি নির্ভর করছে। একটি হলো প্রসারণের গতি। আরেকটি হলো মহাবিশ্বের মোট মহাকর্ষীয় টান, যাকে আসলে মহাবিশ্বের ওজন বলা চলে। মহাকর্ষীয় টান যত বেশি হবে, সে টানকে অগ্রাহ্য করতে হলে মহাবিশ্বকে তত বেশি দ্রুত প্রসারিত হতে হবে। জ্যোতির্বিদরা লোহিত সরণ প্রভাব১ পর্যবেক্ষণ করে সরাসরি প্রসারণ হার বের করতে পারেন। কিন্তু মহাবিশ্বের ভাগ্য কী ঘটবে সে প্রশ্নের সমাধান হয়নি। দ্বিতীয় রাশিটি, মানে মহাবিশ্বের ওজন নিয়ে সমস্যাটা এখনও রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের ওজন কীভাবে জানা সম্ভব? কাজটাকে সথেষ্ট কঠিন মনে হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা সরাসরি করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মহাকর্ষ তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে আমরা এর ওজন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। ওজনের একটি নিম্নসীমা সহজেই পাওয়া যায়। গ্রহদের ওপর সূর্যের মহাকর্ষীয় টান পরিমাপ করে সূর্যের ওজন (ভর) জানা যায়। আমরা জানি, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রায় একশ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) নক্ষত্র আছে। এদের গড় ভর আমাদের সূর্যের ভরের সমান। ফলে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্যালাক্সির ন্যূনতম ভরের একটি প্রাথমিক হিসাব পাই। এবার আমাদেরকে দেখতে হবে মহাবিশ্বে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে। এরা সংখ্যায় এত বেশি যে এদেরকে এক এক করে গোণা যাবে না। তবে অনুমাননির্ভর বেশ ভালো একটি হিসাব হলো দশ বিলিয়ন (এক হাজার কোটি)। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়ায় ১০২১ সৌর ভর। অন্য কথায় ১০৪৮ টন। এই গ্যালাক্সিগুলোর সমাবেশের ব্যাসার্ধ পনের বিলিয়ন আলকবর্ষ ধরে নিলে মহাবিশ্বের মুক্তিবেগের ন্যূনতম একটি মান পাওয়া যাবে। এই মানটি দাঁড়ায় আলোর বেগের এক শতাংশ। আমরা যদি ধরে নেই যে মহাবিশ্বের ভর শুধু নক্ষত্রের ভর হিসাব করেই পাওয়া যাবে, তাহলে মহাবিশ্ব নিজের মহাকর্ষীয় টানকে অগ্রাহ্য করে চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে।২

অনেক বিজ্ঞানীরই বিশ্বাস, মহাবিশ্বের ভাগ্যে ঠিক এটাই ঘটবে। তবে কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ ও কসমোলজিস্ট বলছেন ভরের সমষ্টি হয়ত সঠিকভাবে হিসাব করা হয়নি। আমরা যেসব বস্তু দেখতে পাচ্ছি বাস্তবে বস্তু আছে তার চেয়ে বেশি। মহাবিশ্বের সব বস্তু তো আর উজ্জ্বল নয়। নক্ষত্র, গ্রহ৩ ও ব্ল্যাক হোলদের মতো অনুজ্জ্বল বস্তুরা আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ধুলি ও গ্যাস। যাদের বেশিরভাগই সহজে চোখে পড়ে না। আরও কথা আছে। গ্যালাক্সির মাঝখানের স্থানও কিন্তু একেবারেই ফাঁকা নয়। পদার্থ আছে এখানটায়ও। খুব সম্ভব এখানে আছে বিপুল পরিমাণ হালকা গ্যাস।

তবে আরেকটি চমকপ্রদ সম্ভাবনাও কয়েক বছর ধরে জ্যোতির্বিদদের নজর কেড়ে রেখেছে। যে বিগ বিং এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা, সেই বিস্ফোরণটিই আমাদের দেখা সব বস্তুর উৎস। কিন্তু আমরা দেখি না এমন কিছু বস্তুরও উৎস সেই বিস্ফোরণ। মহাবিশ্ব যদি অতিপারমাণবিক কণার এক উত্তপ্ত আধার হিসেবেই শুরু হয়ে থাকে, তবে সাধারণ বস্তুর উপাদান আমাদের পরিচিত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া অন্যসব কণাও বিপুল পরিমাণ তৈরি হয়ে থাকবে। কণাপদার্থবিদরা সম্প্রতি পরীক্ষাগারে এই কণাগুলো শনাক্ত করেছেন। এই কণাগুলো খুবই অস্থিতিশীল। ফলে এরা খুব দ্রুতই ক্ষয় হয়ে যাবার কথা। তবে এদের কিছু কিছু হয়ত আজও অবশিষ্ট আছে। মহাবিশ্বের সূচনার ধ্বংসাবশেষ হিসেবে।

এই ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো নিউট্রিনো। সেই ভূতুড়ে কণাগুলো, যাদের সুপারনোভায় খুব সক্রিয় (দেখুন চতুর্থ অধ্যায়)। আমরা যতটুকু জানি, তাতে নিউট্রিনোরা ক্ষয় হয়ে অন্য কিছুতে পরিণত হতে পারে না। (আসলে নিউট্রিনো আছে তিন রকমের। এক ধরনে নিউট্রিনো অন্য নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই দিকটা আপাতত আমরা বিবেচনা থেকে বাদ দিচ্ছি) ফলে বিগ ব্যাং এর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া মহাজাগতিক নিউট্রিনো দিয়ে মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ থাকার কথা। আদিম মহাবিশ্বে সব ধরনের অতিপারমাণবিক কণা সমানভাবে তৈরি হয়েছিল ধরে নিলে হিসেব করে জানা সম্ভব কতগুলো মহাজাগতিক নিউট্রিনো থাকা উচিৎ। হিসেব করে দেখা গেল প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউট্রিনোর পরিমাণ হওয়া উচিৎ ১০ লক্ষ। অন্য কথায়, সাহদারণ বস্তুর প্রতিটি কণার বিপরীতে নিউট্রিনোর সংখ্যা হওয়া উচিত প্রায় একশ কোটি।

দারুণ এই ফলাফলটি আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে। প্রতি মুহূর্তে আপনার দেহের মধ্যে একশ বিলিয়ন নিউট্রিনো উপস্থিত আছে। যার প্রায় সবই বিগ ব্যাং এর ধ্বংসাবশেষ। অস্তিত্বের একদম শুরু থেকে এরা এখনও মোটামুটি একই অবস্থায় আছে। নিউট্রিনোরা আলোর সমান বা কাছাকাছি গতিতে চলে। এ কারণে এরা মুহুর্তের মধ্যে আপনার শরীরের ভেতর দিয়ে চলে যায়। প্রতি সেকেন্ডে একশ বিলিয়ন নিউট্রিনো এই কাজ করে। এই অবিরাম চলাচল আমরা খেয়াল করি না কারণ নিউট্রিনোরা সাধারণ বস্তুর সাথে খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করে। ফলে কোনো একটি আপনার দেহের মধ্যে আটকে যাবে সেই সম্ভাবনা খুব সামান্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শূন্যস্থানে এত নিউট্রিনোর উপস্থিতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে বড় প্রভাব রাখতে পারে।

নিউট্রিনোরা খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করলেও অন্য সব কণার সাথে তাদের মহাকর্ষীয় বল কিন্তু কাজ করে। তারা হয়ত আশেপাশের অন্য কণাকে খুব বেশি ঠেলা-ধাক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাদের পরোক্ষ মহাকর্ষীয় প্রতিক্রিয়া মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের ভূমিকা কতটুকু সেটা জানতে হলে জানতে হবে তাদের ভর।

মহাকর্ষ নিয়ে হিসাব করতে গেলে দরকার হয় প্রকৃত ভর, নিশ্চল ভর নয়। নিউট্রিনোদের নিশ্চল ভর যদি কমও হয়, আলোর কাছাকাছি বেগে চলার কারণে এদের ভর কিন্তু উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠবে (দেখুন ৩৯ পৃষ্ঠা)। আবার এদের ভর শূন্যও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এরা চলবে আলোর বেগে। তাহলে তাদের শক্তির সাথে তুলনা করে প্রকৃত ভর জানা যাবে। আর মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পাওয়া নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে এই শক্তির হিসাব পাওয়া যাবে বিগ ব্যাং থেকে পাওয়া শক্তির অনুমিত পরিমাণ থেকে। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে শক্তি একটু দুর্বল হচ্ছে। এ কারণে মূল শক্তির পরিমাণকে সংশোধন করে নিতে হবে। তবে এই সংশোধন করে নেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে, শূন্য নিশ্চল ভরের নিউট্রিনোরা মহাবিশ্বের মোট ওজনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

অন্য দিকে, আমরা নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য কি না এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আবার সব ধরনের নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর সমান কি না সেটাও জানা নেই আমাদের। নিউট্রিনো সম্পর্কে বর্তমানে আমরা যা জানি তাতে এদের সসীম একটি নিশ্চল ভর থাকা অসম্ভব নয়। অতএব, পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে হবে আসল কোনটি সঠিক। চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা বলেছি, নিউট্রিনোর ভর থাকলেও সেটা অবশ্যই খুব সামান্য হবে। ভর হবে পরিচিত অন্য যে কোনো কণার চেয়ে কম। কিন্তু মহাবিশ্বে নিউট্রিনোর সংখ্যা অনেক বেশি হবার কারণে খুব সামান্য নিশ্চল ভরও মহাবিশ্বের মোট ওজনে বড় ভূমিকা রাখবে। বিষয়টি খুব সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য মেনে চলে। ইলেকট্রনের (পরিচিত কণিকাদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা) ভরের ১০ হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ পরিমাণ ভরও বড় প্রভাব রাখতে সক্ষম।৪ সেক্ষেত্রে নিউট্রিনোদের ভর হবে নক্ষত্রের ভরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এত ছোট নিশ্চল ভর শনাক্ত করা খুব কঠিন কাজ। এ বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলগুলোও ছিল বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী। তবে একটি বিষয় খুব কৌতূহলের জন্ম দেয়। ১৯৮৭এ সুপারনোভা থেকে পাওয়া গেছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। আগেই বলেছি, নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য হলে তারা অবশ্যই সবাই আলোর সমান গতিতে চলাচল করবে। সবার গতিই কিন্তু সমান হবে এক্ষেত্রে। কিন্তু এদের যদি অল্প হলেও কিছু নিশ্চল ভর থাকে, তাহলে ভর নানান রকম হতে পারে। সুপারনোভা থেকে বের হওয়া নিউট্রিনোরা হবে খুব তেজস্বী। তাই এদের নিশ্চল ভর কিছুটা থাকলেও এরা চলবে আলোর খুব কাছাকাছি গতিতে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে পৌঁছানোর আগে এরা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে চলাচল করার কারণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে সময় বেশি খানিকটা কম-বেশি লাগতে পারে। ১৯৮৭এ সুপারনোভা থেকে আসা নিউট্রিনোদের পৌঁছানোর সময়ের তারতম্য বিশ্লেষণ করে বলা যাবে নিউট্রিনোর সর্বোচ্চ নিশ্চল ভর কত হতে পারে। এবং এভাবে এটা পাওয়া গেছে ইলেকট্রনের ভরের ৩০ হাজার ভাগের প্রায় এক ভাগ।

তবে দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, বিষয়টায় জটিলতা আরও আছে। কারণ নিউট্রিনোর প্রকারভেদ আছে একের বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিশ্চল ভর বের করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী পাউলির প্রস্তাবিত নিউট্রিনো নিয়ে হিসাব করা হয়। কিন্তু পরের দ্বিতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনো পাওয়া গেছে। তৃতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনোর কথা বিগ ব্যাং এর সময়ের এই তিন রকমের নিউট্রিনোই ব্যাপক আকারে তৈরি হয়ে থাকবে। এর মধ্যে বাকি দুই ধরনের নিউট্রিনোর ভরের সীমা কত হবে তা সরাসরি বলা খুব কঠিন। পরীক্ষামূলকভাবে মানের সীমার পাল্লা অনেক বড়। তবে তাত্ত্বিকরা বলছেন, মহাবিশ্বের ভরে নিউট্রিনোর ভর সম্ভবত বড় কোনো ভূমিকা রাখছে না। নিউট্রিনোর ভর বের করার নতুন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আলোকে এই ধারণা বদলেও যেতে পারে।

আবার মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গেলে যে নিউট্রিনো ছাড়া সম্ভাব্য অন্য আরও মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষও থাকতে পারে। বিগ ব্যাং এর সময় অন্যান্য স্থিতিশীল ও দুর্বলভাবে ক্রিয়া করা কণাও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে সেগুলোর ভর আরও বেশি। (তবে ভর আবার বেশি হলে অপেক্ষাকৃত অল্প ভরের কণার তুলনায় এরা কম তৈরি হবে। কারণ বেশি ভরের কণা তৈরিতে বেশি ভর লাগে) এদেরকে সাধারণভাবে বলা হয় উইম্প (WIMP)। কথাটার পূর্ণরূপ হলো দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ভারী কণা (Weakly Interacting Massive Particles)। বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত উইম্প কণার সংখ্যা অনেক। এদের গালভরা নামও আছে। এই যেমন গ্র্যাভিটন, হিগসিনো, ফোটিনো। এরা আসলেই আছে কি না তা কেউ জানে না। তবে আসলেই থাকলে মহাবিশ্বের ওজন মাপতে এদের ভূমিকা মাথায় রাখতেই হবে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, উইম্প কণাদের অস্তিত্ব আছে কি না তা সরাসরিই পরীক্ষা করে ফেলা যায়। সাধারণ পদার্থের সাথে এদের মিথষ্ক্রিয়ার ধরন থেকে এটা অনুমান করা যাবে। এই মিথষ্কিয়া খুব দুর্বল তা সত্য। তবে বিপুল পরিমাণ উইম্প কণার ভর উল্লেখযোগ্য হবে। চলন্ত উইম্প কণা শনাক্ত করতে পরিকল্পনাও করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের একটি লবণের খনি ও স্যান ফ্র্যান্সিস্কোর একটি বাঁধের কাছে এলাকাকে পরীক্ষার স্থান হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। মহাবিশ্বের এদের উপস্থিতি অনেক বেশি ধরে নিলে সবসময় এরা বিপুল সংখ্যায় আমাদের শরীর (এবং পৃথিবী) ভেদ করে চলে যাচ্ছে। এই পরীক্ষার মূলনীতি খুব দারুণ। উইম্প কণা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে ধাক্কা খেলে যে শব্দ হবে, শনাক্ত করা হবে সেই শব্দ।

এর জন্য যন্ত্র বানানো হবে জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের একটি স্ফটিক দিয়ে। যা একটি শীতলীকরণ ব্যবস্থা দিয়ে আবৃত থাকবে। উইম্প কণা স্ফটিকের নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে এর ভরবেগের কারণে নিউক্লিয়াস পেছন দিকে ধাক্কা অনুভব করবে। এ ধাক্কার ফলে স্ফটিক ল্যাটিসে ছোট্ট একটি শব্দ তরঙ্গ বা কম্পন তৈরি হবে। তরঙ্গ প্রসারিত হতে থাকলে এর তীব্রতা একটি কমে আসবে। পরিণত হবে তাপশক্তিতে। ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা শব্দ তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন তাপের সূক্ষ্ম সঙ্কেত শনাক্ত করার জন্যে এ পরীক্ষার নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। স্ফটিকের তাপমাত্রা কমিয়ে প্রায় পরম শূন্য পর্যন্ত আনা হয় বলে যে-কোনো তাপ শক্তির আবির্ভাবকেই ডিটেক্টর দারুণ দক্ষতার সঙ্গে শনাক্ত করে ফেলবে।

তাত্ত্বিকরা ধারণা করছেন, কিছুটা অল্প গতিতে ছোটা ফোটার আকৃতির উইম্পদের ঝাঁকের মধ্যে ডুবে আছে ছায়াপথগুলো। এই উইম্পদের ভর হয়ত একটি থেকে এক হাজার প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি। আর গড় ভর সেকেন্ডে কয়েক হাজার কিলোমিটার। আমাদের সৌরজগৎ আমাদের ছায়াপথকে ঘিরে পাক খাওয়ার সময় এই অদৃশ্য জায়গা অতিক্রম করে। আর পৃথিবীর প্রতি কেজি পদার্থ প্রতি দিন এক হাজারটি পর্যন্ত উইম্প কণা বিক্ষেপ করতে পারে। এই হারে বিক্ষিপ্ত হলে উইম্প কণাকে সরাসরি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবার কথা নয়।

একদিকে উইম্প কণার খোঁজ চলছে। অন্য দিকে জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের ভর জানার চেষ্টাও করে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে দেখা (বা শোনা না গেলেও) এর মহাকর্ষীয় টান কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। নেপচুন গ্রহের আবিষ্কারের কথাই ধরুন না। জ্যোতির্বিদরা খেয়াল করলেন, অচেনা একটি বস্তুর ময়াহকর্ষীয় টানে ইউরেনাসের কক্ষপথে নড়চড় হচ্ছে। লুব্ধক বি একটি অনুজ্জ্বল শ্বেত বামন নক্ষত্র। উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে কেন্দ্র করে ঘোরে এটি। এই বি লুব্ধককেও কিন্তু এভাবেই পাওয়া গেছে। তার মানে, বস্তুর পর্যবেক্ষণযোগ্য গতি খেয়াল করে জ্যোতির্বিদরা অদেখা বস্তুরও চিত্র আঁকতে পারেন। (আমি আগেই বেলছি, কীভাবে এই পদ্ধতিতে সিগ্ন্যাস-১ বস্তুটিকে ব্ল্যাক হোল হিসেবে অনুমান করা হয়েছিল।)

আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্ররা কীভাবে চলছে সে বিষয়ে গত এক বা দুই দশকে খুব নিবিড় গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। সাধারণত নক্ষত্ররা মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রকে বিশ কোটি বছরের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে প্রদক্ষিণ করে। ছায়াপথের আকৃতি কিছুটা চাকতির মতো। কেন্দ্রের দিকে নক্ষত্রের ঘনত্বটা একটু বেশি। ফলে সৌরজগতের সূর্য ও গ্রহের সম্পর্কের মতো প্রায় একই রকম একটি ব্যাপার আছে এখানে। তবে সৌরজগতে বুধ ও শুক্রের মতো পৃথিবী থেকেও ভেতরের দিকের গ্রহগুলো ইউরেনাস বা নেপচুনের মতো বাইরের দিকের গ্রহদের চেয়ে জোরে চলে। এর কারণ হলো ভেতরের দিকের গ্রহগুলো সূর্যের মহাকর্ষীয় টান বেশি অনুভব করে। আমরা হয়ত আশা করব, ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমনই হবে। চাকতির বাইরের দিকের নক্ষত্রগুলো কেন্দ্রের দিকের নক্ষত্রদের তুলনায় অনেক ধীরে ঘোরা উচিত।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ বলছে ভিন্ন কথা। পুরো চাকতি জুড়েই নক্ষত্রদের বেগ প্রায় সমান। ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যেতে পারে, ছায়াপথের ভর হয়ত কেন্দ্রে পুঞ্জিভূত নয়। বরং পুরো ছায়াপথজুড়ে সমভাবে বিস্তৃত। ছায়াপথের চেহারা দেখে মনে হয়, ভর কেন্দ্রেই পুঞ্জিভূত। তবে আলোকজ্জ্বল অংশ হয়ত পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখাচ্ছে না। এটা স্পষ্ট যে প্রচুর পরিমাণ অন্ধকার বা অদৃশ্য বস্তু রয়েছে। এর বড় একটি অংশের অবস্থান চাকতির বাইরের দিকে। আর এটাই সেদিকের নক্ষত্রের বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার চাকতির উজ্জ্বল তলের বাইরে খালি চোখে অদৃশ্য ডার্ক ম্যাটারও থাকতে পারে প্রচুর। এটা হলে আকাশগঙ্গা ঢাকা থাকে বিশাল ভারী এক অদৃশ্য বলয় দিয়ে। এই বলয় আন্তঃছায়াপথীয় স্থানের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি। অন্য ছায়াপথেও একই রকম বিন্যাস চোখে পড়ে। হিসেব বলছে, (সূর্যের তুলনায়) উজ্জ্বলতা দেখে যতটা মনে হয় ছায়াপথের দৃশ্যমান অংশ গড়ে তার দশ গুণের বেশি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। সবচেয়ে বাইরের দিকে অঞ্চলে আবার এই বিস্তৃতি পাঁচ হাজার গুণ পর্যন্তও হতে পারে।

ছায়াপথগুচ্ছের মধ্যে ছায়াপথের চলাচলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পরিষ্কার কথা: কোন ছায়াপথ যথেষ্ট বেগে চললে সেটি ছায়াপথ গুচ্ছের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। গুচ্ছের সব ছায়াপথ এই বেগে ঘুরলে গুচ্ছ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসবে। কোমা মণ্ডলে আছে কয়েকশ ছায়াপথ নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ছায়াপথ পুঞ্জ। এটি নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা করা হয়েছে। এই গুচ্ছে ছায়াপথদের গড় গতিবেগ এতটা বেশি যে এদের পক্ষে এক অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার কথা নয়। এটা একমাত্র সম্ভব যদি ছায়াপথে উজ্জ্বল বস্তুদের ভরের চেয়ে অন্তত কয়েকশ গুণ ভর বেশি উপস্থিত থাকে। কোমা গুচ্ছকে অতিক্রম করতে একটি সাধারণ ছায়াপথের মাত্র প্রায় একশ কোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে এত দিনে গুচ্ছটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা। সেটা কিন্তু ঘটেনি। উপরন্তু, গুচ্ছে কাঠামো দেখে খুব ভালোভাবে মনে হচ্ছে, এটি মহাকর্ষের বন্ধনে আবদ্ধ আছে। মনে হচ্ছে, কোনো এক ধরনের ডার্ক ম্যাটার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত আছে। যা ছায়াপথের গতিকে প্রভাবিত করছে।

মহাবিশ্বের অতি-বড়-মাপকাঠির গঠন থেকে অদেখা বস্তু সম্পর্কে আরও একটি ধারণা পাওয়া যায়। অতি-বড়-মাপকাঠি বলতে আমরা বুঝি ছায়াপথের ক্লাস্টার (গুচ্ছ) ও সুপারক্লাস্টারদের গুচ্ছবদ্ধ হবার প্রক্রিয়া। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বলেছি, ছায়াপথদের বিস্তৃতি অনেকটা ফেনার মতো। ছড়িয়ে পড়া আঁশের মতো। কিংবা বিশাল শূন্যতাকে ঘিরে থাকা চাদরের মতো। বিগ ব্যাংয়ের এর পরে যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে তাতে এমন গুচ্ছবদ্ধ ও ফেনিল কাঠামো গড়ে ওঠার কথা নয়। তবে এটা হতে পারে যদি কোনো অনুজ্জ্বল বস্তু বাড়তি মহাকর্ষ সরবরাহ করে। কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্যে এখন পর্যন্ত সরল কোনো ডার্ক ম্যাটারের ধারণা ব্যবহার করে এ রকম ফেনিল কোনো কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়নি।৫ হতে পারে আরও কোনো জটিল উপাদান রয়েছে মহাবিশ্বে।

ডার্ক ম্যাটারের রহস্য বুঝতে বিজ্ঞানীরা এখন ব্যতিক্রমী কিছু কণার খোঁজ করছেন। তবে ডার্ক ম্যাটার পরিচিতি বস্তুর আকারেও থাকতে পারে। সেটা হতে পারে গ্রহের আকারের অনুজ্জ্বল নক্ষত্র। এমন অন্ধকার বস্তু হয়তো আমাদের অজান্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের চারাপাশের মহকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি জ্যোতির্বিদরা দৃশ্যমান বস্তুদের সাথে মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ অন্ধকার বস্তুদেরকে খুঁজে পাওয়ার একটি উপায় বের করেছেন। এ কৌশলে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার একটি ফলাফল ব্যবহার করা হয়। নাম মহাকর্ষীয় বক্রতা (Gravitational lensing)।

আমরা জানি, মহাকর্ষ আলোকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, দূরের নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময় কিছুটা বেঁকে যাবে। এর ফলে আকাশে নক্ষত্রটির আপাত অবস্থান একটু পাল্টে যাবে। আশেপাশে সূর্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির প্রভাব লক্ষ করে এই পূর্ভাবাস যাচাই করে দেখা যায়। কাজটি প্রথম করেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ আর্থার এডিংটন। ১৯১৯ সালে। দারুণভাবে তিনি আনিনস্টাইনের বক্তব্যটি প্রমাণ করেন।

লেন্সও আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে দেয়। এর ফলে এরা আলোকে কেন্দ্রীভূত করে বিম্ব (ছবি) তৈরি করতে পারে। একটি ভারই বস্তু যথেষ্ট প্রতিসম হলে লেন্সের মতোই আচরণ করবে। দূরের উৎস থেকে আসা আলোকে কেন্দ্রীভূত করবে। এমন একটি ঘটনা ৬.১ চিত্রে দেখানো হয়েছে। উৎস S থেকে আলো একটি গোলকীয় বস্তুর কাছে এসে পড়লে বস্তুর মহাকর্ষ এর পাশের আলোকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে। ফলে আলোকরশ্মিগুলো দূরের আরেকটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। বেশিরভগা বস্তুর ক্ষেত্রেই বক্রতার প্রভাব খুব সামান্য। তবে বিশাল দূরত্বের ক্ষেত্রে আলোর চলার পথের সামান্যটুকু বক্রতাও উল্লেখযোগ্য ফোকাস তৈরি করবে। বস্তুটা যদি পৃথিবী ও দূরবর্তী উৎসের মাঝখানে থাকে, তাহলে উৎসের খুব উজ্জ্বল একটি ছবি দেখা যাবে। আবার কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে দৃষ্টিরেখা জায়গামতো পড়লে আলোর উজ্জ্বল বৃত্তও দেখা যেতে পারে। একে বলা হয় আইনস্টাইন বলয় (Einstein ring)। আরও জটিল বস্তুর ক্ষেত্রে লেন্সিংয়ের ফলে একটির বদলে অনেকগুলো ছবি তৈরি হবে। মহাজাগাতিক মাপকাঠিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষীয় বক্রতার অনেকগুলো উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবী ও দূরবর্তী কোয়াসারের প্রায় নিখুঁত অবস্থানে কোয়াসারের অনেকগুলো ছবি তৈরি হয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃত্তচাপ। কিছুক্ষেত্রে আবার কোয়াসারের পুরো বৃত্তও দেখা যায়।

চিত্র ৬.১ চিত্র: মহাকর্ষীয় লেন্স। দূরবর্তী উৎস S থেকে আসা আলো ভারী বস্তুর প্রভাবে বেঁকে যায়। অনুকূল ক্ষেত্রে এটি আলোকে কেন্দ্রীভূত করে। ফোকাস বিন্দুতে থাকা পর্যবেক্ষক বস্তুর চারপাশে আলোর একটি বলয় দেখতে পাবেন।

অদৃশ্য গ্রহ ও অনুজ্জ্বল বামন নক্ষত্র খুঁজতে গিয়ে জ্যোতির্বিদরা এমন বক্রতার সন্ধান করেন। বস্তুটা পৃথিবী ও দূরের কোনো নক্ষত্রের মাঝে থাকলে বক্রতা সেই খবর বলে দেবে। দৃষ্টিরেখা থেকে অদেখা বস্তুটির নড়াচড়ার কারণে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় দৃশ্যমান উঠা-নামা চোখে পড়বে। বস্তুটা নিজে অদৃশ্য হলেও লেন্সিংয়ের মাধ্যমে এর প্রভাব বোঝা যাবে। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে কিছু বিজ্ঞানী আকাশগঙ্গা ছায়াপথের হ্যালোতে (halo) অদৃশ্য বস্তুর খোঁজ করছেন। অবশ্য দূরবর্তী নক্ষত্রের সাথে অবস্থান একই রেখায় না হবার সম্ভাবনা খুব কম হলেও অদৃশ্য বস্তুর সংখ্যা বেশি হলে মহাকর্ষীয় বক্রতা দেখা যাবেই। ১৯৯৩ সালের কথা। অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি দল নিউ সাউথ ওয়ালসের মাউন্ট স্ত্রোমলো পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড ছায়াপথের নক্ষত্রদের দেখছিলেন। মহাকর্ষীয় বক্রতার প্রথম সত্যিকার নিদর্শন তাঁরাই খুঁজে পান। এটা ছিল আমাদের ছায়াপথের হ্যালোতে থাকা একটি বামন নক্ষত্রের লেন্সিং।

ব্ল্যাক হোলরাও মহাকর্ষীয় লেন্স হিসেবে কাজ করে। ছায়াপথের বাইরের বেতার উৎস ব্যবহার করে এমন ব্ল্যাক হোলকে ব্যাপকভাবে খোঁজা হয়েছে। (আলোক তরঙ্গের মতো একইভাবে বেতার তরঙ্গও বেঁকে যায়। ) অবশ্য সম্ভাব্য বস্তু পাওয়া গেছে খুব কমই। এটা থেকে মনে হচ্ছে, নাক্ষত্রিক বা অতি-ভারী ব্ল্যাক হোলরা হয়ত ডার্ক ম্যাটারের জন্য খুব বেশি দায়ী নয়।

তবে সব লেন্সিংয়ের জরিপে সব ব্ল্যাক হোল কিন্তু দেখাও যাবে না। এটাও আবার সম্ভব যে বিগ ব্যাং পরবর্তী চরম অবস্থায় আণুবীক্ষণিক (microscopic) ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয়ে থাকবে। এদের আকার হবে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চেয়ে ছোট। এক্ষেত্রে এদের ভর হবে একটি সাধারণ গ্রহাণুর ভরের সমান। এভাবে প্রচুর পরিমাণ ভর অদৃশ্য থাকতে পারে। এই ভর ছড়িয়েও থাকবে পুরো মহাবিশ্বে। শুনতে অবাক লাগলেও এই অদ্ভুত বস্তুগুলোর ভরেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা বের করা সম্ভব। কৌশলটার নাম হলো হকিং প্রভাব (Hawking effect)। ৭ম অধ্যায়ে আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত জানব। সংক্ষেপে বলা যায়, আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলরা বিস্ফোরিত হয়ে এক ঝাঁক বৈদ্যুতিক চার্জগ্রস্থ কণা তৈরি হতে পারে। এই বিস্ফোরণ ঘটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে। এটা নির্ভর ক্রে ব্ল্যাক হোলের সাইজের ওপর। ছোট ব্ল্যাক হোলরা বিস্ফোরিত হয় দ্রুত। একটি গ্রহাণুর সমান ভরের ব্ল্যাক হোল বিস্ফোরিত হয় এক হাজার কোটি বছর পার হলে। তার মানে বর্তমান সময়ের কাছাকাছি সময়। এই বিস্ফোরণের একটি প্রভাব হবে হঠাৎ করে বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি। বেতার জ্যোতির্বিদরা বিষয়টি যাচাইও করে দেখেছেন। তবে এমন সম্ভাব্য কোনো সঙ্কেত পাওয়া যায়নি। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি ৩০ বছরে প্রতি ঘন আলোকবর্ষ জায়গায় এমন বিস্ফোরণ একটির বেশি ঘটা সম্ভব নয়। ৫ এর অর্থ হলো, মহাবিশ্বের মোট ভরের খুব সামান্য একটি অংশই আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলগুলো থেকে পাওয়া যাবে।

আরেকটি কথা হলো, মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ নিয়েও একেক জ্যোতির্বিদের একেক মত। মহাবিশ্বের প্রসারণ ঠেকাতে যতটুকু ঘনত্ব প্রয়োজন ঠিক তার চেয়ে কম ন্যূনতম ভরকে বলা হয় সঙ্কট ঘনত্ব (critical density)। হিসেব করে এর ভর পাওয়া গেছে দৃশ্যমান ভরের প্রায় একশ গুণ। টেনেটুনে হলেও এ পরিমাণ ভরের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আশা করতে হবে, ডার্ক ম্যাটারের অনুসন্ধান থেকে শীঘ্রই সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক বা নেতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। আর যাই হোক, মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে এর ওপর।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আলোকে আমরা বলতে পারি না মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে কি না। যদি একসময় এটি সঙ্কুচিত হতে শুরু করে, তবে প্রশ্ন দাঁড়াবে, সেটা কখন? এটা বলতে হলে জানতে হবে মহাবিশ্বের ভর সঙ্কট ভরের চেয়ে কতটা বেশি। যদি এটা শতকরা এক ভাগ বেশি হয়, তাহলে প্রায় এক ট্রিলিয়ন (বা এক লক্ষ কোটি) বছর পরে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। আবার যদি সেটা শতকরা ১০ ভাগ বেশি হয়, তাহলে সঙ্কোচন শুরু হয়ে যাবে এখন থেকে ১০ হাজার কোটি বছর পরেই।

তবে কোনো কোনো তাত্ত্বিক আবার মনে করেন, শুধু হিসেব-নিকেশ করেই মহাবিশ্বের ভর বের করে ফেলা সম্ভব। তাদের মতে, কষ্ট করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই। নিছক যুক্তির ক্ষমতা ব্যবহার করেই যে মানুষ মহাজাগতিক জ্ঞানও আহরণ করে ফেলতে পারে এমন বিশ্বাস গ্রিক দার্শনিকদের পর্যন্ত ছিল। আধুনিক যুগেও কিছু কসমোলজিস্ট মহাবিশ্বের ভরকে গণিতের ছকে চেয়েছেন বেঁধে ফেলতে চেয়েছেন। তাদের মতে, গভীর কোনো নীতিমালা মহাবিশ্বের ভরের একটি নির্দিষ্ট মান সরবরাহ করবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে তাক লেগে যায় সেই সিস্টেমগুলো দেখে, যেগুলো দিয়ে মহাবিশ্বের কণার সংখ্যার সঠিক পরিমাণ সাংখ্যিক সূত্র দিয়ে বের করা যায়।

বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন এমন চিন্তাগুলো দেখতে-শুনতে দারুণ হলেও বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই পছন্দ করেন না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি জোরালো তত্ত্ব একটু জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি মহাবিশ্বের ভর সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট পূর্বাভাস দিতে পারছে। তত্ত্বটি হলো তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত স্ফীতি তত্ত্ব।

স্ফীতি তত্ত্বের একটি পূর্বাভাস হলো মহাবিশ্বে উপস্থিত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে। ধরা যাক, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে সঙ্কট ভর ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি বা অনেক কম মান নিয়ে। স্ফীতি যুগ শুরু হলে ঘনত্বের আমূল পরিবর্তন ঘতে যায়। তত্ত্বের ভাষ্য মতে, ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের মানের খুব কাছে চলে আসে। মহাবিশ্ব যত বেশি সময় ধরে স্ফীত হতে থাকে, ঘনত্ব ততই সঙ্কট মানের কাছাকাছি হতে থাকে। তত্ত্বটির আদর্শ নমুনা অনুসারে, স্ফীতি যুগের মেয়াদ ছিল খুব সামান্য। তাই, অলৌকিক কিছু না ঘটে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্বের ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের ঠিক সমান হওয়ার কথা নয়। সামান্য কম-বেশি হবেই।

তবে স্ফীতির সময়ে ঘনত্বের মান সঙ্কট মানের দিকে যেতে থাকে সূচকীয় হারে। ৬ ফলে ঘনত্বের চূড়ান্ত মান সঙ্কট মানের চেয়ে একটু বেশি হতে পারে। স্ফীতি যুগ যদি সেকেন্ডের খুব সামান্য এক ভগ্নাংশ সময় পরিমাণও টিকে থাকে তবুও এটাই হওয়ার কথা। এখানে সূচকীয় বলতে বোঝানো হচ্ছে, স্ফীতির প্রায় প্রতি একক বাড়তি সময়ের জন্যে বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের সঙ্কোচন পর্যায়ের মধ্যে সময় দ্বিগুণ হবে। ফলে একশ একক স্ফীতি সঙ্কোচনে ১০ হাজার কোটি বছর দেরি হবে। আবার একশ একটি একক স্ফীতির জন্যে সঙ্কোচন শুরু হবে ২০ হাজার কোটি বছর পরে। এবং একশ দশ একক স্ফীতির জন্যে সঙ্কোচন শুরু হবে এক লক্ষ কোটি বছর পরে।

স্ফীতি যুগ কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল? কেউ সেটা জানে না। তবে যেসব মহাজাগতিক ধাঁধার কথা আমি বলেছি, সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে স্ফীতির সময় ন্যূনতম কয়েক একক (প্রায় একশ, যদিও মানটি এদিক-সেদিক হতে পারে) হতেই হয়। তবে কোনো উর্ধ্ব সীমা নেই। ধরুন, কাকতালীয়ভাবে এমন ঘটেছে যে আমাদের বর্তমান পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্যে স্ফীতির যে ন্যূনতম একক দরকার ঠিক ততটাই হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও স্ফীতির পরেও ঘনত্ব সঙ্কট ভরের চেয়ে অনেক বেশি (বা কম) হবে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ থেকে সঙ্কোচন যুগ বের করতে পারার কথা। অথবা সঙ্কোচন না হয়ে থাকার কথা থাকলে সেটাও বোঝা যাবে। তবে স্ফীতি ন্যূনতম সময়ের চেয়ে আরও অনেক বেশি সময় ধরে চলার সম্ভাবনাই অনেক বেশি। এর ফলে ঘনত্বের মান হবে সঙ্কট মানের খুব কাছাকাছি। তার মানে, মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে থাকলেও সেটা আরও বহু কাল পরের কথা। মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের চেয়েও বেশি সময় লাগবে তাতে। সেটাই হয়ে থাকলে মানুষ কখনোই নিজের মহাবিশ্বের ভবিষ্যতটাই জানবে না।

অনুবাদকের নোটঃ

১। ক্রমশ দূরে সরতে থাকা বস্তুর একটি ফলাফল হলো লোহিত সরণ প্রভাব (red shift)। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে প্রায় সব গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণে এদের থেকে আসা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যায়। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়। আর সবচেয়ে কম নীল আলোর। গ্যালাক্সিরা দূরে সরতে সরতে এদের থেকে আসা আলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে লাল দিকে চলে আসে। এটারই নাম লোহিত সরণ। আবার উল্টো দিকে কোনো গ্যালাক্সি বা অন্য কোনো বস্তু কাছে আসলে তার আলো চলে যায় নীল দিকে। স্বাভাবিকভাবেই একে বলা নীল সরণ (blue shift)।

২। কারণ মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে বহু গ্যালাক্সি এখনই আলোর কাছাকাছি, এমনকি বেশি বেগেও ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। মুক্তিবেগ আলোর মাত্র এক শতাংশ হলে সে প্রসারণ থামার কোনো কারণ নেই। মহাকর্ষের টানকে অগ্রাহ্য করে পিছিয়ে না এসে দূরে চলে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় বেগকেই কিন্তু মুক্তিবেগ বলা হয়।

৩। রাতের আকাশে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখলেও খালি চোখে কিন্তু মাত্র ৫টি গ্রহ দেখতে পাই। মানে, সৌরজগতের সবগুলো গ্রহই কিন্তু খালি চোখে দেখা সম্ভব হয় না। মনে হতে পারে, টেলিস্কোপ দিয়েও অনেক গ্রহ দেখতে পাই। আসলে টেলিস্কোপ দিয়েও নক্ষত্রদের তুলনায় গ্রহ ঢের কম দেখা যায়। আকারে ছোট হওয়ার কারণে ও নিজস্ব আলো না থাকায় দূরের গ্রহদেরকে টেলিস্কোপে পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মাত্র ৩৯১৭ টি বহির্গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে নক্ষত্রের অবস্থান উল্লেখ করা বিভিন্ন তালিকাতেই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের নাম আছে।

৪। ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর ৯.১০৯ × ১০-৩১ কেজি। মানে দশমিকের পর ৩০টি শূন্য দিয়ে ৯১০৯ লিখলে যে সংখ্যাটি হবে।

৫। ঘন মিটার যেমন বস্তু বা স্থানের আয়তন পরিমাপে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি ঘন আলোকবর্ষ একক দিয়েও স্থানের আয়তন পরিমাপ করা যায়। আলো এক বছরে যতটুকু যায় সেটা হলো এক আলোকবর্ষ। তার মানে আলোকবর্ষ সময়ের একক নয়, বরং দূরত্বের একক। এবার ঘনকের মতো একটি কক্ষের কথা চিন্তা করুন। এবার এই কক্ষের দৈর্ঘ্যকে এক আলোকবর্ষ ভাবুন। তাহলে এই কক্ষটির আয়তনই হবে এক ঘন আলোকবর্ষ।

৬। আমরা গাণিতিক ও জ্যামিতিক হারের সাথে পরিচতি। সূচকীয় হার জ্যামিতিক হারেরই একটি রূপ। গাণিতিক হার বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। জ্যামিতিক হার মানে প্রতি বার বাড়ার পর যে মান দাঁড়াবে তার ভিত্তিতে বাড়া। আর সূচকীয় হারও জ্যামিতিক হার। তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পরপরের বদলে প্রতি মুহূর্তে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি। আরও জানতে দেখুন- statmania.info।